সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস
Social Inequality and Stratification

ইউনিট ৮

সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হলো সামাজিক অসমতা ও সামাজিক স্তরবিন্যাস। পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মানুষ সমান বলা হলেও বাস্তবে সকল ক্ষেত্রে অসমতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, রাষ্ট্রীয় সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি নজর দেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে সবখানে সামাজিক অসমতা বিরাজমান। বিভিন্ন ধরনের অসমতার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক অসমতা, আয় ও সম্পদের অসমতা, সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের অসমতা, বয়স ও জাতিগত অসমতা, শ্রমের বিভাজন ও অসমতা, সমাজের সদস্য হিসেবে অসমতা ইত্যাদি। অন্যদিকে, স্তরবিন্যাস সর্বজনীন। একমাত্র আদিম সমাজ বাদে অন্য কোনো সমাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সমাজের মানুষের মধ্যে বিভাজন নেই। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজসমূহের ধরনগুলোর আলোচনায় মূলত দেখানো হয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সমাজ, যেমন-সামন্ত সমাজের ভিত্তি হচ্ছে ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে উঠেছে মূলত: ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। ভিন্ন সূচকের মানদন্ডে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের মানুষ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সেই স্তরবিন্যাসকে মেনে চলেছে। স্তর বিন্যাসের চারটি ধরন এখানে আলোচনা করা হবে। যথা- দাস প্রথা, সামন্ত প্রথা, সামাজিক শ্রেণি এবং বর্ণ প্রথা।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৮.১: সামাজিক অসমতা: ধারণা, উৎপত্তি ও প্রকারভেদ
পাঠ- ৮.২: সামাজিক স্তরবিন্যাস: ধারণা ও প্রকারভেদ
পাঠ- ৮.৩: সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ: দ্বন্দ্বমূলক ও ক্রিয়াবাদী
পাঠ- ৮.৪: সামাজিক শ্রেণি: ধারণা, গঠন ও উপাদান
পাঠ- ৮.৫: জেন্ডার: ধারণা ও মতবাদ
পাঠ- ৮.৬: জেন্ডার বৈষম্যের সামাজিক প্রভাব
পাঠ- ৮.৭: বৈষম্যবাদ: ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যসমূহ
পাঠ- ৮.৮: সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা এবং উপায়

পাঠ-৮.১ সামাজিক অসমতা : ধারণা, উৎপত্তি ও প্রকারভেদ
Social Inequality: Concept, Origin and Types

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক অসমতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সামাজিক অসমতার উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসমতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক অসমতা।

মৌলিক ধারণা

সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক অসমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মানুষ সমান বলা হলেও বাস্তবে সকল ক্ষেত্রে অসমতা লক্ষ কার যায়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি নজর দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, সর্বত্র সামাজিক অসমতা বিরাজমান। উদাহরণ হিসেবে বর্তমান সমাজের বিভিন্ন পদ, সেবার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সর্বত্র অসমতা। সমাজে যারা ভালো অবস্থান ও সেবা ভোগ করে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। যারা কম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে বিভিন্ন কাজে, অধিকারের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় তারা হলো সমাজের সাধারণ শ্রেণি। আবার পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা নারীর উপর কর্তৃত্ব আরোপ করে। সুতরাং সবদিক থেকেই সামাজিক অসমতা বিদ্যমান। সামাজিক অসমতা উত্তরাধিকার ব্যবস্থার মত আমাদের সমাজ কাঠামোর সাথে জড়িত হয়ে আছে। এটি অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে থাকবে।

সামাজিক অসমতার সংজ্ঞা

সাধারণভাবে যদি সামাজিক অসমতাকে বোঝাতে চাই তাহলে সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ, সামাজিক অবস্থান ও পরিচিতি এবং পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে যে অসম অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে সেটাই হলো সামাজিক অসমতা। সামাজিক অসমতা হলো সামাজিক ভিন্নতা তৈরির এমন এক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা সামাজিক মান-মর্যাদা, যশ ,খ্যাতি, বিত্ত বৈভব ইত্যাদি বিকশিত হয় ও ব্যক্তি সমাজে পরিচিত লাভ করে।

সামাজিক অসমতা বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সমাজের সদস্যবৃন্দ অসম পরিমাণ বা মাত্রায় সম্পদ, যশ, খ্যাতি ও ক্ষমতার অধিকারী– Oxford Advanced Learner's Dictionary।

যখন সমাজের কতিপয় লোক অন্যান্যদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা, সম্পদ অথবা খ্যাতির অধিকারী হয় তখন সেখানে সামাজিক অসমতা বিরাজ করে– রবার্টসন।

সামাজিক অসমতা এমন একটি ক্রমোচ্চমানকে নির্দেশ করে যেখানে অন্যান্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পদের তুলনায় কতিপয় ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পদের কাঙ্খিত জিনিস বা বিষয়বস্তু রয়েছে– এম. গিন্সবার্গ।

সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

ক্ষুদ্র সমাজ কাঠামোর দিকে তাকালেও আমরা সামাজিক অসমতার উপস্থিতি লক্ষ করি। প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সমাজেও অসমতা ছিল। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক শ্রেণি ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনের মাধ্যমে সব সমাজেই অসমতা টিকে আছে। এখানে সামাজিক অসমতা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর ধারণা উপস্থাপন করা হল:

সামাজিক অসমতা ও এরিস্টটল: অসম সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন-"প্রাকৃতিকভাবেই কিছু মানুষ স্বাধীন ও কিছু মানুষ দাস"। তিনি বিভিন্ন কারণে দাস প্রথাকে সমর্থন করেছেন। এরিস্টটল মূলত দাসত্ব প্রথার সমর্থনে বক্তব্য দিতে গিয়ে সামাজিক অসমতা বিষয়ে ব্যাখা করেন। তিনি বলেন, কিছু

মানুষ প্রাকৃতিকভাবে মেধাবী, বিচক্ষণ ও ক্ষমতাধর আর কিছু মানুষ প্রজ্ঞাহীন। প্রজ্ঞাহীনরা সমাজে দাসত্ব করবে আর জ্ঞানীরা সমাজের নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটাই স্বাভাবিক। এদের অধীনে থাকবে দেশের সাধারণ মানুষ।

সামাজিক অসমতা ও কার্ল মার্কস: কার্ল মার্কস ও তাঁর সহযোগীরা মনে করেন যে, সমাজজীবনের সূচনাকাল থেকে সামাজিক অসমতা ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুনাফা হলো মুখ্য বিষয় আর এক্ষেত্রে মালিক শ্রেণি সবসময় শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে। মালিক শ্রেণি শোষণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে অসমতা টিকিয়ে রাখে।

সামাজিক অসমতা ও এমিল ডুর্খেইম: এমিল ডুর্খেইমের বক্তব্য এর সাথে এরিস্টটলের বক্তব্যের মিল রয়েছে। ডুর্খেইম বলেন যে, প্রাকৃতিকভাবে কিছু মানুষ মেধাবী যারা অন্যদের থেকে আলাদা। সমাজের পরিচালনা ও বড় কাজগুলো মেধাবীরা পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে, অন্যন্য কাজগুলো সাধারণ মানুষেরা করে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ফলে মেধাবীরা সমাজের মর্যাদায় আসনে আসীন হয়। এভাবে সামাজিক অসমতার সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসমতা

সামাজিক অসমতা সমাজের সবক্ষেত্রে বিদ্যমান। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসমতার বর্ণনা দেওয়া হলো:

রাজনৈতিক অসমতা: রাজনৈতিক অসমতা বর্তমান সমাজে লক্ষণীয়। রাজনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ক্ষমতাশালীরা ভোগ করে। এছাড়াও আইনের সুযোগ লাভের অধিকার এর উপর রাজনৈতিক অসমতা নির্ভর করে।

আয় ও সম্পদের অসমতা: সম্পদের মালিকানা ও আয়ের বৈষম্য বিভিন্ন সমাজে লক্ষ করা যায়। সম্পদ মূলত সমান সুযোগ মুষ্টিমেয় শ্রেণির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আয়ের ক্ষেত্রেও সম্পদের মতো বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

নাগরিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে অসমতা: মানুষের জীবনকে অর্থবহ করার জন্য সমাজে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মতো ক্ষমতা সবার থাকে না। ফলে অসমতার সৃষ্টি হয়।

জেন্ডার ও জাতিগত অসমতা: সমাজে জেন্ডারের তারতাম্যের বিচারে অসমতা লক্ষ করা যায়। অনেক সমাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা বিরাজ করে। একজন পুরুষ তুলনায় একজন নারী সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে না। জাতিগত অসমতা সকল সমাজে কম বেশি বিদ্যমান। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে অসমতার মূল কারণ জাতিগত ভিন্নতা।

শ্রমের বিভাজন ও সামাজিক অসমতা: শ্রমের বিভাজনেও অসমতা লক্ষণীয়। একটি সমাজে বিভিন্ন পেশা বিদ্যমান আর এক্ষেত্রে পেশাগত ও কর্মদক্ষতার ভিন্নতা সামাজিক অসমতা তৈরি করে।

সমাজের সদস্য হিসেবে অসমতা: সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির যে সমতার রয়েছে সেটা নানা কারণে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। সমাজের সদস্য হিসেবে অধিকার ভোগ করা সম্ভব হয় না। সম্পদশালী ব্যক্তিরা সমাজে অসমতার অন্যতম কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসমতা সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ, সামাজিক অবস্থান ও পরিচিতি এবং পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে যে অসম অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয় সেটাই হলো সামাজিক অসমতা। যখন সমাজের কতিপয় লোক অন্যদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা, সম্পদ অথবা খ্যাতির অধিকারী হয় তখন সেখানে সামাজিক অসমতা বিরাজ করে। সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে কম বেশি সামাজিক অসমতা বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'প্রাকৃতিকভাবেই কিছু মানুষ স্বাধীন ও কিছু মানুষ দাস'- উক্তিটি কার ?

(ক) এরিস্টটল (খ) প্লেটো (গ) জন লক (ঘ) কার্ল মার্কস

পাঠ-৮.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস : ধারণা ও প্রকারভেদ
Social Stratification: Concept and Types

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা বলতে পরাবেন;
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	সামাজিক স্তরবিন্যাস, দাসপ্রথা, সামন্তপ্রথা বর্ণপ্রথা ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকেই একে অন্যের থেকে আলাদা। বয়স, লিঙ্গ, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই একজন মানুষ আরেকজন মানুষের মত হয় না। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে আমরা সহজেই একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক করে ফেলি। এ বিবেচনা অনুসারে আমরা কাউকে দক্ষ, কাউকে অদক্ষ, ভালো-মন্দ ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করে থাকি। এ ধরনের শ্রেণিকরণকে সামাজিক বিভাজন বলা হয়। সমাজে আরেক ধরনের সামাজিক শ্রেণিকরণ আমাদের চোখে পড়ে-সেটি পদমর্যাদার ভিত্তিতে। ব্যক্তির এই পদমর্যাদার মূলে তাঁর আর্থিক সক্ষমতা, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, জন্মসূত্রে পাওয়া পরিচিতি ও সম্মান ইত্যাদি অনেক কিছু। যেভাবেই এ পদমর্যাদা তৈরি হোক না কেনো- এর ভিত্তিতে সমাজের মানুষকে আমরা স্তরে স্তরে ভাগ করে ফেলি এবং তার সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করি।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা

সামাজিক বৈচিত্র্য, বিভাজন ও স্তরবিন্যাস অনেকটা প্রকৃতির নিয়মের মতোই সত্য। মানব সমাজের কথাই ধরা যাক। শারীরিক সৌন্দর্য্য, অবয়ব, বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকতার ধারণা, দর্শন, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা, ধর্মীয় অনুরাগ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিচারে মানুষ একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে সৃষ্ট পদমর্যাদার নিরিখে আমরা সমাজের মানুষকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করি একেই সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে।

"যে প্রক্রিয়ায় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ কিংবা দলকে স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে একেক পদমর্যাদার অধিকারী বলে বিন্যস্ত করা হয় তাকে স্তরবিন্যাস বলে।" অগবার্ণ ও নিমকফ

"সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষদেরকে স্থায়িভাবে দল অনুযায়ী বিন্যাস করা এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখা।" জিসবার্ট

জিসবার্ট (Gisbert) তাঁর *'Fundamental of Sociology'* গ্রন্থে বলেছেন, "সমাজকে একটি স্থায়ী দল বা প্রকরণে বিভক্ত করাই হচ্ছে সামাজিক স্ড়রবিন্যাস, যেখানে একে অন্যের সাথে উচ্চক্রম এবং নিম্নক্রমের ভিত্তিতে সম্পর্কিত। সামাজিক স্ড়রবিন্যাসের আলোকে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ছাড়াও শাসক, শোষিত, মালিক–শ্রমিক, ধনী–দরিদ্র শ্রেণি পরিলক্ষিত হয়।"

অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সূচক অনুসারে সমাজের মানুষকে মর্যাদার ভিত্তিতে বিভক্ত করা। এই স্তরবিন্যাস সমাজ দীর্ঘ সময় ধরে ধারণ করে এবং মেনে চলে।

স্তরবিন্যাসের ধরনসমূহ

স্তরবিন্যাসের চারটি ধরন এখানে আলোচনা করা হলো। যথা- দাস প্রথা, সামন্ত প্রথা, সামাজিক শ্রেণি এবং বর্ণ প্রথা।

দাস প্রথা: দাস প্রথা হল সমাজের অসমতার এক চরম নিদর্শন। মানব ইতিহাসের যে পর্যায়ে দাস প্রথার প্রচলন হয়েছিল সেখানে দাস নামে আখ্যায়িত এক শ্রেণির মানুষকে দাস মালিকেরা নিজেদের কাজে নির্বিচারে ব্যবহার করত। কোনো কোনো আইনে (যেমন হাম্মুরাবি প্রণীত আইন) দাস ব্যবস্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং দাসকে কেউ পালাতে সাহায্য করলে বা পলাতক দাসকে কেউ আশ্রয় দিলে তাকে শাস্তি পেতে হতো। দাসদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, দাস

মালিকদের ইচ্ছানুসারেই শ্রম দিতে হতো। দাস ছিল দাস মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনেকটা হালের লাঙল, বলদ ইত্যাদির মতো। দাসদের কোনো অধিকার ছিল না। সমাজের স্বাধীন মানুষ অপেক্ষা দাসের মর্যাদা অনেক নিচে ছিল। অন্যান্য পণ্যের ন্যায় খোলাবাজারে দাস কেনাবেচা হতো এবং অনেক ক্ষেত্রে দাস মালিক কোনো কোনো দাসকে আজীবনের জন্য কিনে নিত। আদিম সমাজে দাসের কয়েকটা উৎস ছিল-কেউ যুদ্ধবন্দী হয়ে, কেউ ঋণগ্রস্থ হয়ে দাসে পরিণত হতো। কেউ বা বংশানুক্রমে দাসত্ব করতো।

সামন্ত প্রথা: ইউরোপের সামন্ত সমাজে এ প্রথা প্রধানত প্রচলিত ছিল বলা হলেও এর ব্যাপ্তি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সামন্ত প্রথার আংশিক প্রমাণ মেলে। এ ব্যবস্থা মূলত সম্রাটের ভূমি ব্যবস্থাপনায় বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সম্রাট তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত ভূমিকে সামন্ত রাজাদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এর মাধ্যমে সামন্ত রাজারা সম্রাটের সাথে এক ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। এ চুক্তি অনুসারে নিজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বা অন্য সাম্রাজ্য দখলের প্রয়োজনে সম্রাটের পরামর্শ বা সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন হলে সামন্তরাজারা তা প্রদান করে সম্রাটকে সাহায্য করতেন। সামন্ত রাজারা তাঁদের জমি অভিজাত শ্রেণিকে আর অভিজাত শ্রেণি নাইটদেরকে, নাইটরা (যোদ্ধা শ্রেণি) কৃষককে খাজনার বিনিময়ে ভূমি জায়গীর হিসেবে প্রদান করতেন। এভাবেই সামন্ত সমাজে ভূমিভিত্তিক স্তরবিন্যাসের প্রচলন ছিল।

বর্ণপ্রথা: বর্ণভিত্তিক স্তরায়ন মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত। কোনো আর্থিক সচ্ছলতা বা মালিকানার ভিত্তিতে নয় বরং এ প্রথানুসারে মানুষের জন্মগ্রহণই তার পদমর্যাদা নির্ধারণ করে দেয়। এ প্রথার প্রচলন ও রীতিনীতিকে আইনসিদ্ধ করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ প্রথা অনুসারে মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে সে পরিবারের মান ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে নবজাতকের মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বর্ণপ্রথার বিভিন্ন ধরন দেখা যায়। যেমন: প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র– এই চার ধরনের বর্ণ দেখা যায়। এ বিভাজন জন্মসূত্রে। হিন্দু শাস্ত্রে গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভাজনের কথা বলা হলেও প্রাচীন কাল থেকে জন্মসূত্রে এ বিভাজন চলে আসছে। পশ্চিমা সমাজে গায়ের বর্ণের ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস দেখা যায়। এ স্তরবিন্যাসও জন্মসূত্রে। জন্মসূত্রে ব্যক্তি যে সামাজিক মর্যাদা পেয়ে থাকে সে সারাজীবন সে মর্যাদা ভোগ করে। বর্ণপ্রথা অনুসারে সামাজিক গতিশীলতার প্রায় কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে।

সামাজিক শ্রেণি: শ্রেণি প্রত্যয়টি মূলত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। মূলত অর্থ সম্পদ, পেশা, শিক্ষার ভিত্তিতে এ বিভাজন করা হয়ে থাকে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটা শ্রেণি সহজেই অন্য শ্রেণির থেকে আলাদা হয়ে থাকে। সম্পদের মালিকানা বা আর্থিক সচ্ছলতার ভিত্তিতে সমাজের আলাদা আলাদা গোষ্ঠীগুলোতে শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করার এ প্রথা শুরু হয়েছে শিল্প বিপ্লবের পরপরই। শিল্প সমাজের বিকাশের সাথে সাথে মানুষের আর্থিক সম্পদের বৃদ্ধির ফলে সমাজে ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি শ্রেণির বিকাশ হতে থাকে।

অগবার্ন ও নিমকফের মতে, সামাজিক শ্রেণি হল সমাজে বসবাসকারী এমন এক ধরনের মানুষের সমাহার যাদের প্রায় একই ধরনের আর্থিক সম্পদ থাকার কারণে একই ধরনের সমাজিক মর্যাদা রয়েছে। মার্কসীয় সংজ্ঞা অনুসারে শ্রেণি হল এমন এক গোষ্ঠী যাদের উৎপাদনের উপাদানের সাথে একই ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমাজে উৎপাদনের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটাই মুখ্য বিষয়। উৎপাদনের উপায়সমূহ যার বা যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তার একটা শ্রেণি (পুঁজিপতি) আর যাদের হাতে সে নিয়ন্ত্রণ থাকে না তারা অন্য শ্রেণি, যেমন-সর্বহারা, শ্রমিক শ্রেণি।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজজীবনে স্তরবিন্যাস সম্পর্কে লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে যথা সম্পদ, পেশা, শিক্ষা, বর্ণ, জাতি, নরগোষ্ঠী, জেন্ডার ইত্যাদির নিরিখে আমরা সমাজের মানুষকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করি যাকে। সামাজিক স্তর বিন্যাস বলে। যদিও বলা হয় সকল সমাজেই স্তরবিন্যাস বর্তমান এবং এটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। মানব সমাজে মূলত চার ধরনের স্তরবিন্যাস লক্ষণীয়, এগুলো হলো- দাস প্রথা, সামন্ত প্রথা, সামাজিক শ্রেণি এবং বর্ণ প্রথা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক অসমতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'দাস প্রথা কে সমর্থন করেছেন কে ?

(ক) এরিস্টটল (খ) কার্ল মার্কস

(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) প্লেটো

২। নিচের কোনটি সামাজিক অসমতা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ?

(ক) রাজনৈতিক অসমতা (খ) সম্পদের অসমতা

(গ) বয়সের অসমতা (ঘ) কর্মক্ষেত্রে অসমতা

পাঠ-৮.৩ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ
Theory of Social Stratification

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ব্যাখ্যা পারবেন;

মুখ্যশব্দ	সামাজিক স্তরবিন্যাস, ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা সকল সমাজে স্তরবিন্যাসের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। তাঁদের মতে, আদিম সমাজেও কমবেশি স্তরবিন্যাস ছিল। তবে আদিম সমাজে স্তরবিন্যাসের ধরন ছিল খুব সাধারণ প্রকৃতির। নারী ও পুরুষের মধ্যে, বয়স্ক ও কমবয়সীদের মধ্যে, বিবাহিত ও অবিবাহিতদের মধ্যে সামান্য ভিন্নতা লক্ষণীয়। বিভিন্ন সমাজের একেক রকমের মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন পদ-মর্যাদার বিষয়টা গড়ে উঠতো ও তার চর্চা করা হতো। মুলত অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় জ্ঞান, শিকারে দক্ষতা, বিনিময়ে বা বাণিজ্যে দক্ষতা, সৌন্দর্য্য, দৈহিক গড়ন, নেতৃত্বের ক্ষমতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে একেক সমাজে একেকভাবে স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই স্তরবিন্যাস সার্বজনীন কিনা কিংবা এটা সৃষ্টির কারণই বা কী এমন প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞানীরা ভিন্নভাবে উত্তর খুঁজেছেন। সমাজে স্তরবিন্যাস কতখানি গুরুত্ব বহন করে এমন বিষয়েও তারা নানা মত পোষণ করেন। এখানে আমরা এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরব।

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ক্রিয়াবাদীরা মনে করেন সমাজে অনেকটা মানবদেহের মত। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন আলাদা আলাদা কাজ করে থাকে এবং এর মাধ্যমে সমগ্র মানবদেহে ভারসাম্য তৈরি হয়। ঠিক তেমনি সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যদি নিজ নিজ ক্রিয়াগুলো করে তাহলে সমগ্র সমাজে শৃংখলা বজায় থাকবে ও সুষ্ঠুভাবে চলবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানী কিংসলি ডেভিস এবং উইলবার্ট মুর মনে করেন, সমাজে স্তরবিন্যাসের দরকার রয়েছে। সমাজ অবশ্যই তার সদস্যদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদা ভাগ করে দেবে। সমাজের সদস্যরা মেধা ও যোগ্যতা অনুসারেই পুরস্কার, গুরুত্ব, সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা ভোগ করবে।

ডেভিস এবং মুর মনে করেন, স্তরবিন্যাস সর্বজনীন এবং সমাজে অসমতার দরকারও রয়েছে। অসমতা আছে বলেই মানুষ এক অবস্থান থেকে আরো উন্নততর অবস্থান তৈরীর চেষ্টা চালায়, তার সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে সচেষ্ট হয়। এর বিপরীতে সমালোচকেরা বলেছেন, মানুষের মধ্যে পদমর্যাদার পরিবর্তন আনতে, উৎসাহ যোগানোর উদ্দেশ্যে অসমতার সৃষ্টি করা হয়েছে এমন যুক্তি যথার্থ নয়। মানুষ তার ব্যক্তিগত সুখের আশায় আত্ম-সন্তুষ্টির জন্য, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ থেকেও তার পদমর্যাদা বাড়াতে আগ্রহী হতে পারে। এসব তাড়না থেকেও সে নিরন্তর কাজ করার উৎসাহ পেতে পারে। ক্রিয়াবাদীরা সমালোচনা স্বীকার করেই মনে করেন, সমাজের উচিত যে ধরনের কাজে অধিক পরিশ্রম হয়, দীর্ঘ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় এমনকি বিপদজনক ধরনের যেসব কাজ রয়েছে সেসব কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা। এর ফলে মানুষ এ ধরনের কাজে নিযুক্ত হতে উৎসাহ বোধ করবে।

ক্রিয়াবাদীদের বিশ্লেষণ সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। এছাড়া যেসব পদমর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে মানুষ তা ভোগ করে। যেমন- দাস, সামন্তপ্রভু, প্রচুর পুঁজির মালিকানা–এ ধরনের জীবনব্যাপি অসমতার কারণ কী তার কোনো সন্তোষজনক উত্তর ক্রিয়াবাদীরা দিতে পারেননি।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

কার্ল মার্কসের লেখনী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলভিত্তি রচনা করেছে। মার্কসের বিশ্লেষণে ইতিহাস হলো শোষক ও শোষিতের মধ্যেকার নিরন্তর সংগ্রামের বাস্তবতা। এই দ্বন্দ্ব তথা সংগ্রাম একটা সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যখন সমাজ সম্পূর্ণ

শ্রেণিহীন সমাজে রূপান্তরিত হবে। এই সংগ্রাম কেবল তখনই থামবে। স্তরবিন্যাসের ব্যাখ্যায় তিনি মনে করেন, সমাজে কেবল দুটি প্রধান শ্রেণিই বিরাজ করছে। এর একটি হলো বুর্জোয়া–যারা সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে ও একচ্ছত্র পুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে এবং অপরটি প্রলেতারিয়েত–যারা নিরন্তন শোষিত হয়ে চলেছে। বুর্জোয়া হলো সম্পদের মালিক শ্রেণি অন্যদিকে প্রলেতারিয়েত হলো শ্রমিক শ্রেণি । মার্কস কখনোই মনে করেননি যে, স্তরবিন্যাস অনিবার্য ও সর্বজনীন। তাঁর মতে, স্তরবিন্যাস হলো সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি।

মার্কসের মতোই সমসাময়িক দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, সমাজের সীমিত সম্পদ নিয়ে মানুষ তার সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। মার্কস শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে, তাঁর অনুসারীরা তথা দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকেরা জেন্ডার, নৃগোষ্ঠীগত, বয়স ও অন্যান্য প্রেক্ষিতে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। এর অর্থ হলো সমাজের সর্বস্তরে সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তথা লড়াই চলছে–এর একদিকে রয়েছে সুবিধাভোগী শেণি আর বিপরীতে আছে সুবিধাবঞ্চিত তথা শোষিত শেণি। শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে।

ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী রাফ ড্যারেনডর্ফ (Ralf Dahrendorf) মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে সময়োপযোগী করে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা দেখিয়েছেন। ড্যারেনডর্ফের মতে, সামাজিক শ্রেণি বলতে এমন কিছু মানুষের সমষ্টি বোঝায় যারা একই ধরনের সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীকে উল্লেখ করাতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন এখানে কেবল পুঁজিপতি বুর্জোয়াই নয় বরং এখানে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, আইন প্রণেতা, বিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, সরকারি আমলাগণ এমন অনেকেই আছেন। সুতরাং ক্ষমতাশালী সংখ্যা ও পদমর্যাদাগত অনেকেগুলো ধাপ তৈরি হয়েছে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে।

দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, আধুনিক ক্ষমতাশালীরা সমাজে কোনো বিশৃংখলা চায় না বরং চায় সমাজ যেন খুব শৃংখলাবদ্ধ ও সুষ্ঠুভাবে চলে যাতে করে তারা নিজেরা তাদের উচ্চ পদমর্যাদা, সুযোগ সংস্কার নিশ্চিন্তে ও নিষ্কন্টকভাবে উপভোগ করতে পারে। তাদের সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতাকে তারা যে কোন মূল্যে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করতে চায় এবং সে কারণেই তারা যে কোন ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্বকে কৌশলে অথবা কঠোর হাতে দমন করতে চায়।

ক্ষমতাবানদের পদমর্যাদা বজায় রাখা ও তা দীর্ঘ সময় ধরে যাতে লালিত পালিত হয় তার একটা উপায় হলো Dominant Ideology। এটি হলো এমন সব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তথা বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সমাহার যা কিনা সমাজের ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার চর্চা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। যেসব রাজা-বাদশারা তাদের রাজসভায় সভাকবি রাখতেন যার কাজই হতো রাজার গুণকীর্তন করে কাব্য রচনা করা। দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকদের যুক্তি হলো ক্ষমতাবানকে গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজেও নাটক, কবিতা ইত্যাদি নানা সাহিত্য রচিত হয় যেগুলোর মূল লক্ষ্য হলো জনগণের মনে শাসক সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করা যাতে জনগণ তাদের সমীহ করে এবং কখনো বিরোধিতা না করে। ধর্ম, শিক্ষা ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে ক্ষমতাবানরা 'Dominant Ideology' প্রচার করে ও জনমতের উপর ক্ষমতাবানদের সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ক্ষমতাবানরা কেবল সম্পদ ও পদমর্যাদাই নিয়ন্ত্রণ করে না, তারা মানুষের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান তথা সংস্কৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

এখানেই শেষ নয়। সমাজের ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে যদি জনগণের কোনো অংশে কোনো প্রকারে আন্দোলনের আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে ক্ষমতাবানরা নানা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব স্থানীয়দেরকে তাদের অধীন করে ফেলে এবং আন্দোলনের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেয়। শ্রমিক কল্যাণের নামে কিছু সাধারণ আইনের প্রয়োগ করে (যেমন- ন্যূনতম শ্রম মজুরী নির্ধারণ, চিকিৎসা সুবিধা, উৎসব ভাতা ইত্যাদি) তারা শ্রমিকদের আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করে। তবে দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকেরা মনে করে এ ধরনের আশা দেখিয়ে শ্রমিকদেরকে চিরদিন দমিয়ে রাখা যাবে না। শোষিতরা একদিন জেগে উঠবে, দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং সমতাভিত্তিক সমাজের দাবী জোরালো হবে। যতদিন শোষিতরা দাবী না তুলছে ততদিন ক্ষমতাবানরা সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যেতে থাকবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন পদ-মর্যাদার বিষয়টির ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস গড়ে উঠছে। ক্রিয়াবাদীরা মনে করেন, সমাজে স্তরবিন্যাসের দরকার রয়েছে। সমাজ অবশ্যই তার সদস্যদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদা ভাগ করে দেবে। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে, সামাজিক স্তরায়ন হলো শাসক ও শোষিতের মধ্যেকার নিরন্তর সংগ্রামের বাস্তবতা। এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম একটা সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যখন সমাজ সম্পূর্ণ শ্রেণিহীন সমাজে রূপান্তরিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলভিত্তি রচনা করেন ?

(ক) ডেভিস (খ) মুর

(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) রাফ ড্যারেনডর্ফ

রহিম মিয়া একটি কারখানায় কাজ করে। তার মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা। সে সারাদিন কাজ করেও পরিবারের ঠিকমত ভরণ পোষণ দিতে পারে না। আর তার কারখানার মালিক আসাদ অফিসে ঠিকমত আসে না। কিন্তু আসাদ সাহেবের অনেক টাকা। সে আবার কিছু পলিসি ব্যবহার করে শ্রমিকদের শোষণও করে।
উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-

(ক) Dominant Ideology বলতে কী বোঝেন?
(খ) শ্রেণি কোন আরোপিত মর্যদান নয় বরং অর্জিত মর্যাদা- ব্যাখ্যা করুন।
(গ) উদ্দীপক সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে- যুক্তি দিন।
(ঘ) উদ্দীপকের রহিম মিয়া ও আসাদ সাহেবের জীবনযাত্রার মান কার্ল মার্কস- এর সামাজিক শ্রেণি তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৮.৪ সামাজিক শ্রেণি
Social Class

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক শ্রেণির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সামাজিক শ্রেণির গঠন উপাদান আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	সামাজিক শ্রেণি , স্তরবিন্যাস, পদমর্যাদা, গোষ্ঠী, উপাদান ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সামাজিক স্তরবিন্যাসে চারটি প্রক্রিয়াগত ধরন হলো– দাসপ্রথা, বর্ণপ্রথা, সামন্তপ্রথা এবং সামাজিক শ্রেণি । এর মধ্যে দাসপ্রথা দাসভিত্তিক সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বর্ণপ্রথা বিশেষত ধর্ম ও জাতিবর্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সামন্তপ্রথা গড়ে উঠেছিল ভূমি মালিকানাকে কেন্দ্র করে। সামাজিক শ্রেণির ধারণা এগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সামাজিক শ্রেণি হলো বৃহৎ পরিসরের সামাজিক গোষ্ঠী যারা একই পরিমাণে অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকারী এবং যারা প্রায় একই মানের জীবনযাপন করে। মূলত সম্পদের মালিকানা, পেশার ধরন, শিক্ষা, মর্যাদা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ইত্যাদি সামাজিক শ্রেণির মূল নির্ধারণী উপাদান।

সামাজিক শ্রেণির সংজ্ঞা

পি. জিসবার্টের মতে, সামাজিক শ্রেণি হলো *"একটা শ্রেণি বা জনসমষ্টি সমাজে যাদের একই ধরনের পদমর্যাদা রয়েছে, এই পদমর্যাদাই অন্য জনসমষ্টির সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করে।"* (A social class is a category or group of persons having a definite status in society which permanently determines their relation to other groups. – P. Gisbert)

অগবার্ন ও নিমকফের মতে, *"সামাজিক শ্রেণি এমন কিছু মানুষের সমষ্টি, সমাজে যাদের একই ধরনের সামাজিক পদমর্যাদা রয়েছে।"* (A social class is the aggregate of persons having essentially the same social status in a given society. – Ogburn and Nimkoff)

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, *সামাজিক শ্রেণি হলো কিছু মানুষের সমষ্টি যাদের সম্পদ আহরণের একই রকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবং যাদের জীবন যাত্রার মান একই রকমের।* (Social classes are aggregates of individuals who have the same opportunities of acquiring goods, the same exhibited standard of living – Max Weber)

উপরের সংজ্ঞা থেকে এটা বলা যায় যে, সামাজিক শ্রেণি হলো সমাজের এমন একেকটা জনগোষ্ঠী যার সদস্যরা একই পদমর্যাদার অধিকারী।

আধুনিক সমাজের স্তরবিন্যাসের মূল নির্ধারক হলো সামাজিক শ্রেণি। আধুনিক সভ্য সমাজের স্তরবিন্যাস বোঝাতে সামাজিক শ্রেণি অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা ও পেশাগত পরিচয় ভিত্তিক প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। চারটি প্রধান কারণে সামাজিক শ্রেণি পূর্বেকার স্তরবিন্যাসের প্রক্রিয়াগত ধরনগুলো, যথা দাসপ্রথা, বর্ণপ্রথা, সামন্তপ্রথা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

সামাজিক শ্রেণির গঠন উপাদান

সামাজিক শ্রেণি গঠনে বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা রয়েছে। যেমন:

ক) **শ্রেণি হলো মর্যাদাগত গোষ্ঠী:** সামাজিক শ্রেণি হলো একই সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন মানুষের সমষ্টি। অর্থাৎ শ্রেণি সবসময় পদমর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষ বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত বলেই মানুষের মর্যাদাও ভিন্ন হয়, আর মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন হয় বলেই সমাজে মানুষের শ্রেণি ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

খ) **শ্রেণি কোনো আরোপিত মর্যাদা নয় বরং অর্জিত মর্যাদা:** আমরা জানি সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় মর্যাদা দু রকমের হয়। জন্মের সাথে সাথে পরিবার মানুষকে যে মর্যাদা দেয় তা পরিবার কর্তৃক আরোপিত মর্যাদা বলে। ব্যক্তি নিজে কঠোর পরিশ্রম করে পরবর্তীকালে যে মর্যাদা অর্জন করে। যেমন: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যাংকের ম্যানেজার, কলেজের প্রভাষক ইত্যাদি) তাকে অর্জিত মর্যাদা বলা হয়। সামাজিক শ্রেণি মানুষ তার চেষ্টা দ্বারা অর্জন করে বলে এটা প্রায়শই অর্জিত পদমর্যাদা (তবে এর ব্যতিক্রমও সম্ভব)।

গ) **উপলব্ধির ধরন:** প্রত্যেক শ্রেণির উপলব্ধির ধরনও ভিন্ন ভিন্ন। তিন ধরনের শ্রেণিগত উপলব্ধি সমাজে বিদ্যমান (ক) প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের নিজেদের মধ্যে একটা সমতার উপলব্ধি রয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি যে শ্রেণির বলে নিজেকে মনে করে সেই শ্রেণির সাথে সে একাত্মতা অনুভব করে (খ) সমাজের অপেক্ষাকৃত মধ্য বা নিচু শ্রেণির মানুষেরা তাদের থেকে উঁচু মর্যাদার মানুষের তুলনায় নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে হীনমন্যতায় ভোগে (গ) অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা তাদের থেকে কম মর্যাদার মানুষের তুলনায় নিজেদের মর্যাদা বিষয়ে অতি উচ্চ মানসিকতা পোষণ করে।

ঘ) **মর্যাদার উপাদান:** ব্যক্তির সমাজে অবস্থানের সাথে তার মর্যাদার বিষয়টা জড়িত। ধনী শ্রেণি ও শাসক শ্রেণি প্রতিটা সমাজেই সব থেকে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। সমাজ কোনো কোনো উপাদানকে মূল্যায়ন করে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারণ করবে এটা হয়ত সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিভিন্ন সমাজে জ্ঞান তথা পান্ডিত্য, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বংশ মর্যাদা, নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, সম্পদ, সাহসিকতা বীরত্ব ইত্যাদিকে বিভিন্নভাবে বড় করে দেখা হয়। আধুনিক সমাজে আমরা দেখি এগুলোর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থানও অনেক বড় করে বিবেচিত হয়।

ঙ) **জীবনযাপনের ধরন:** একটা সামাজিক শ্রেণিকে অন্য সামাজিক শ্রেণি থেকে আলাদা করার সহজ উপায় হলো তাদের জীবনযাপনের ধরন কেমন সেটা দেখা। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লাইফ স্টাইলও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। জীবনযাপনের ধরন বলতে আমরা অনেক কিছু একত্রে বুঝি, যেমন- পোষাক পরিচ্ছদ, বাসগৃহের ধরন, বসতি এলাকা, প্রতিবেশির ধরন, শিক্ষালাভের প্রকৃতি, বিনোদনের ধরন, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন, ব্যবহৃত মিডিয়ার প্রকৃতি, যোগাযোগের প্রকৃতি ও যানবাহন ব্যবহারের ধরন, প্রযুক্তির উপস্থিতির ধরন, উপার্জন ও ব্যয়ের প্রকৃতি ইত্যাদি। জীবনযাপনের ধরন একেক শ্রেণির একেক ধরনের পছন্দ-অপছন্দ, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও রুচিবোধর পরিচয় দেয়।

চ) **সামাজিক শ্রেণি হলো অর্থনৈতিক গোষ্ঠী:** সমাজের মানুষের মর্যাদা যা কিছুর উপরই নির্ভর করুক না কেন সামাজিক শ্রেণির মূল ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক। প্রত্যেকটি শ্রেণির অর্থনৈতিক ভিত্তির সাথে যুক্ত হয় কিছু বস্তুগত ও অবস্তুগত বিষয়। অবস্তুগত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে শ্রেণি চেতনা, শ্রেণি সংহতিবোধ এবং শ্রেণি পরিচয়। অন্যদিকে, বস্তুগত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সম্পদ, সম্পত্তি, উপার্জন, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি। এসব কিছু মিলেই একেকটা শ্রেণি তৈরি হয়ে থাকে।

ছ) **সামাজিক শ্রেণি প্রকরণ:** আধুনিক শ্রেণি বিন্যাসকে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের শ্রেণির উল্লেখ করেছেন । যথা-(১) উঁচু শ্রেণি (২) নিম্ন-উচ্চ শ্রেণি (৩) উচ্চ-মধ্য শ্রেণি(৪) নিম্ন-মধ্য শ্রেণি (৫) উচ্চ-মধ্য শ্রেণি এবং (৬) নিম্ন-মধ্য শ্রেণি । সামাজিক শ্রেণি আলোচনার পথিকৃৎ কার্ল মার্কস মাত্র দুটি শ্রেণির কথা বলেছেন– "আছে" দের শ্রেণি এবং "নাই" দের শ্রেণি ("haves"and "have nots")। যাদের আছে তাদেরকে তিনি বলেছেন পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণি এবং যাদের নেই তাদেরকে তিনি বলেছেন শ্রমিক শ্রেণি তথা প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক শ্রেণির গঠন উপাদান সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক শ্রেণিএমন কিছু মানুষের সমষ্টি, সমাজে যাদের একই ধরনের সামাজিক পদমর্যাদা রয়েছে। সামাজিক শ্রেণি হলো বৃহৎ পরিসরের সামাজিক গোষ্ঠী যারা একই পরিমাণে অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকারী এবং যারা প্রায় একই মানের জীবন যাপন করে। মূলত: সম্পদের মালিকানা ও পেশার ধরনই সামাজিক শ্রেণির মূল নির্ধারণী উপাদান। সামাজিক শ্রেণিকে সার্বজনীন বলা যেতে পারে। আধুনিক সভ্য সমাজের স্তরবিন্যাস বোঝাতে সামাজিক শ্রেণি (অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা ও পেশাগত পরিচয় ভিত্তিক) প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। শ্রেণিগত পরিচয় জন্মসূত্রে নির্ধারিত নয়। মানুষ যে পরিবারেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেনো সে তার চেষ্টা দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থান ও পেশাগত পরিচয় তৈরি করে নিতে পারে তথা শ্রেণিগত অবস্থানও নির্ধারণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কার্ল মার্কস নিচের কোন দুইটি শ্রেণির কথা বলেছেন ?

(ক) উঁচু ও নিম্ন শ্রেণি (খ) উচ্চমধ্যে ও নিম্নমধ্যে শ্রেণি

(গ) আছে ও নাই শ্রেণি (ঘ) কোনটিই নয়।

২। সমান্তপ্রথা কোনটি কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ?

(ক) জমি (খ) ধর্ম

(গ) অর্থ (ঘ) পেশা

পাঠ-৮.৫ জেন্ডার : ধারণা ও মতবাদ
Gender: Concept and Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জেন্ডারের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- জেন্ডার স্তরবিন্যাসের সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন;
- জেন্ডারের ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, নারীবাদী দৃষ্টিভিঙ্গি, মিথষ্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	জেন্ডার, ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মিথষ্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

জন্মসূত্রেই সমাজে কেউ নারী কেউ পুরুষ। শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে খুব সহজেই আমরা এই নারী-পুরুষ বিভাজনটাকে চিহ্নিত করতে পারি। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী পুরুষ বিভাজনের বিষয়টিকে লিঙ্গ বিভাজন বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জেন্ডার হলো সমাজসৃষ্ট। একারণে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে জেন্ডারের ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সমাজ যে বিভাজন রেখা টেনে দেয় তাকে জেন্ডার নামে আখ্যায়িত করা হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি। বাঙালি সমাজে দুঃখ পেলেও জনসমক্ষে কোনো ছেলে সচরাচর কান্নাকাটি করে না। ধরে নেওয়া হয় এটা পুরুষ সুলভ আচরণ নয়। সমাজের ধারণা কান্নাকাটি করা মেয়েলি আচরণ। পুরুষ হবে কঠিন, নারী হবে কোমল হৃদয়ের। সমাজ মনে করে মেহেদী দিয়ে হাত সাজানো, নখপালিশ ব্যবহার–এসব মেয়েলি ব্যাপার। পুরুষেরা কখনো তাদের হাত পা এভাবে সাজায় না। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই উদাহরণগুলোতে নারী ও পুরুষের যে ভূমিকা তথা জেন্ডার ভূমিকা, শারীরিক, প্রকৃতিগত বা (Biological) নয়।

জেন্ডার স্তরবিন্যাসের সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

পৃথিবীর নানা প্রান্তের সমাজ বিশ্লেষণে দেখা গেছে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ, প্রভাব ও প্রাধান্য রয়েছে এমন সমাজই সবচেয়ে বেশি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্য প্রায় নেই বললেই চলে। সমাজবিজ্ঞানীরা এ বিষয়টির ব্যাখ্যা খুঁজতে চেয়েছেন বিভিন্নভাবে এবং দেখেছেন এর পেছনে সমাজ ও সংস্কৃতিই দায়ী। এরপরও সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে জেন্ডার বিশ্লেষণে ভিন্নমত পোষণ করেন।

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি: ক্রিয়াবাদীরা মনে করে সমাজ হলো মানব দেহের মতো। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথা-নাক, কান, গলা, কিডনীর মতো সমাজেরও বিভিন্ন অংশ রয়েছে, যেমন-সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান ও সংঘ। মানবদেহের প্রত্যেকটা অংশ যদি নিজের কাজটি (Function) ঠিক মত করে তবে পূর্নাঙ্গ মানবদেহটি সুস্থ থাকে। ঠিক তেমনি সমাজের প্রত্যেকটি অংশ যদি নিজের কাজগুলো ঠিকমত করে তবে সমাজে শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। প্রত্যেকটা অংশের ক্রিয়া বা কাজকে কেন্দ্র করে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত বলে একে ক্রিয়াবাদ বলা হয়। ক্রিয়াবাদীরা মনে করে জেন্ডার বিভাজন সমাজকে স্থিতিশীলতা দান করেছে। অর্থ্যাৎ জেন্ডার বিভাজনের দরকার রয়েছে সমাজে স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য। সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স ও রবার্ট বেল্‌স (Talcott Parsons and Robert Bales, 1955) দেখিয়েছেন যে, পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরা অবশ্যই বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নারী পুরুষ যখন পরিবার গঠন করে সেই পরিবারে পুরুষ ও নারী তার নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে পারিবারিক বন্ধন টিকিয়ে রাখবে। এই জেন্ডার ভূমিকা প্রত্যেক সমাজেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। প্রতিটা সমাজে এ ঐতিহ্য দীর্ঘসময় ধরে চলে আসছে। যদি কোনো কারণে এই জেন্ডার ভূমিকা পালন ব্যাহত হয় তাহলে পারিবারিক স্থিতিশীলতাও ব্যাহত হবে।

ক্রিয়াবাদীদের মতানুসারে নারী মানসিক সমর্থনের ভূমিকা গ্রহণ করবে, উৎসাহ যোগাবে। অন্যদিকে, পুরুষ সক্রিয় ভূমিকা নেবে। নারী তার পরিবারের সম্প্রীতি বজায় রাখতে চেষ্টা করবে, নারী হবে আবেগপ্রবণ, মানসিক আশ্রয় ও সমর্থনের উৎস। ক্রিয়াবাদী মতানুসারে, নারীর এই ভূমিকা পুরুষকে স্বস্তি দেয় ও তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রিয়াবাদীদের কথার অর্থ এই নয় যে এসব ঐতিহ্যবাহী জেন্ডার ভূমিকায় কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না, বরং তারা বলতে চেয়েছেন যে পরিবারের নারী-পুরুষের মধ্যকার শ্রম বিভাজনই হলো একটা কার্যকর পদ্ধতি যার সাহায্যে পরিবার একটি স্বতন্ত্র একক হিসেবে টিকে থাকতে সমর্থ হয়।

জেন্ডার সম্পর্কিত ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যা প্রথমদিকে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও পরবর্তীকালে সমালোচনার শিকার হয়। বলা হয়েছে যে, এই মতবাদ নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। এটি একটি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি। নারীকে ঘরের কাজ সামলাতে হবে এমন ধারণা সমাজসৃষ্ট, এর কোন প্রকৃতিগত বা জৈবিক ভিত্তি নেই।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা অসম ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে। ক্রিয়াবাদীরা এই অসম ক্ষমতা সম্পর্কের বিষয়টিকে কখনোই তুলে ধরেন না। নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন শ্রম বিভাজনের সাথে যে অসম পদমর্যাদার বিষয়টাও জড়িত সেটাও তারা বলেন না। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতা ও মর্যাদার দ্বান্দ্বিক বিষয়কে তুলে ধরে। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মতে, সমাজে জেন্ডার শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের কাজকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তা নারীর মর্যাদাকে ছোট করে তুলে ধরে। পুরুষের কাজকে অধিকতর মূল্যায়ন করা হয়। পেশাগত কাজে নারী ও পুরুষ একইসাথে যুক্ত থাকলেও নারীর থেকে পুরুষের আর্থিক ও সামাজিক পুরস্কার তুলনামূলক বেশি।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে, ঐতিহ্যগতভাবেই দীর্ঘ সময় ধরে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষমতার সম্পর্ক বিরাজ করছে। এ সম্পর্কের মধ্যে পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য ধরে রাখতে চায়, তার কারণ সে শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী, শারীরিক আকৃতিতেও প্রায়শই বড়, সন্তান ধারণের মত শারীরিক দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয় না। এসব শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে সামাজিকভাবেও নিজের আধিপত্য জাহির করতে চায়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও পুরুষশাসিত সমাজ তার এ ইচ্ছাকেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। যদিও সমসাময়িক সমাজে এ বিষয়টা ততটা গুরুত্বের চোখে দেখা হয় না। ঐতিহ্য, প্রথা, দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল নারী পুরুষের মধ্যকার এই সম্পর্ককে সহজভাবে মেনে নিতে শিখিয়ে চলেছে।

দ্বান্দ্বিক ব্যাখা মতে, জেন্ডার ভূমিকা পালনে যে পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় তা হলো– পরিবারে ও সমাজে একটা গোষ্ঠী আনুগত্যের ভূমিকা গ্রহণ করে (বিশেষত নারী) এর বিপরীতে একটা গোষ্ঠী আধিপত্যের ভূমিকা পালন করে (পুরুষ)। পুরুষের কাজকে আর্থিক পুরস্কার, সম্মান ও পদমর্যাদা দিয়ে পুরষ্কৃত করা হয়, পক্ষান্তরে নারীর কাজকে কখনো মূল্যায়নের প্রশ্নও উঠে না। নারীর ভূমিকা সমাজে অবমূল্যায়িত, অবহেলিত।

নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিঃ জেন্ডার এর দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যার একটা শাখা নিয়ে তৈরি হয়েছে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও এ নামকরণ সাম্প্রতিক কালের কিন্তু এই আলোচনার ধারা অনেক পুরোনো। এ সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। যেমন: ১৭৯২ সালে প্রকাশিত মেরি উলস্টোনক্রাফাটের A Vindication of the Rights of Women, ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিল এর The Subjection of Women এবং ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর The Origin of the Family Private Property and the State. এঙ্গেলস তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, নারীর প্রতি অবমূল্যায়ন শুরু হয়েছে সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠার পরপরই। এর আগে এমনটি হয়নি। কুটির শিল্প আবিষ্কারের পর পুরুষ যখনই অবসর পেয়েছে তখন সে বিলাসে মেতেছে, নারীকে সে অবদমিত করে রেখেছে। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স এর সূত্র ধরেই নারীবাদীরা বলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে শোষণ ও অবিচারের জন্ম হয়েছে এবং নারী এখানে শোষিত ও নির্যাতিত। কিছু নারীবাদী দাবি করেন, পুঁজিবাদী সমাজে নারীর এই পরিণতি অনিবার্য এবং সকল পুরুষ শাসিত সমাজেই এটা দেখা যায়। পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা যে কোনো সমাজ তা যদি পুরুষশাসিত হয় তাহলে সেখানে নারীকে এ পরিণতি মেনে নিতে হয়।

মিথষ্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গিঃ আমরা দেখি ক্রিয়াবাদী ও দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকরা জেন্ডার সম্পর্ককে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে, মিথষ্ক্রিয়াবাদীরা জেন্ডারকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা জেন্ডারভিত্তিক ও আচরণগত। আমরা দেখতে পাই আমাদের সমাজে পুরুষ সদস্যরা নিজেদের মতামতকে বেশি

জাহির করে ও প্রাধান্য দিতে চায়, নারী সদস্যদের কথা তারা কম গুরত্ব দেয়। নারী যদি সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়, ভাল চাকরি করে– তারপরও নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রবণতা অনেক পুরুষেরই আছে। ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে তারা কেবল পুরুষকে ভাবে, নারীকে অধস্তন মনে করে। আমাদের দৈনন্দিন আচরণে এসব বাস্তবতা বিরাজমান।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেন্ডার স্তরবিন্যাসের সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

জেন্ডার সামাজিকভাবে সৃষ্ট নারী ও পুরুষের অসমতা যেখানে নারীরা নানাভাবে পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক বাস্তবতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে জেন্ডারের ধারণাও ভিন্ন। সমাজে নারী ও পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে যে বিভাজন বিদ্যমান তাকে জেন্ডার নামে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ সমাজকর্তৃক বেঁধে দেওয়া নারী পুরুষের আলাদা আলাদা ভূমিকা পালনকেই জেন্ডার বলা হয়। ক্রিয়াবাদীরা মনে করে জেন্ডার বিভাজন সমাজকে স্থিতিশীলতা দান করেছে। অর্থাৎ জেন্ডার বিভাজনের দরকার রয়েছে সমাজে স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতা ও মর্যাদার দ্বান্দ্বিক বিষয়কে তুলে ধরে। দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা অসম ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। The subjection of women প্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয় ?

(ক) ১৮৫৯ (খ) ১৮৬৯

(গ) ১৮৭৯ (ঘ) ১৮৮৯

২। The origin of the family private property and the state প্রন্থটির রচয়িতা কে ?

(ক) মেরি উলস্টোনক্রাফাটের (খ) জন স্টুয়ার্ট মিল

(গ) ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (ঘ) সেলিনা হোসেন

৩। জেন্ডার বলতে মূলত কোনটিকে বুঝায় ?

(i) দৈহিক

(ii) সামাজিক

(iii) রাজনৈতিক

নিচের কোনটি

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i+ ii + iii

পাঠ-৮.৬ জেন্ডার বৈষম্যের সামাজিক প্রভাব
Social Impact of Gender Discrimination

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জেন্ডার বৈষম্যের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- জেন্ডার ও সামাজিকীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	জেন্ডার বৈষম্য, সামাজিকীকরণ, সুযোগ সুবিধা, মালিকানা ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

জেন্ডার বৈষম্যের সমস্যাটি প্রায় মানব ইতিহাসের মতই পুরোনো। এ বৈষম্য দূর করতে কোনো সমাজই পুরোপুরি মাত্রায় সফল হয়নি। এ বৈষম্য একেক সমাজে একেক মাত্রায় বিরাজমান এবং এর চর্চা দৈনন্দিন জীবনের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে তার পুরোপুরি মূলোৎপাটন প্রায়শই দূরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশে এক সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের সংবিধানে সকলের অধিকারকে মূল্যায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। গণতন্ত্রচর্চা এবং মানবাধিকারকে এদেশের গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। কিন্তু একই সাথে সমঅধিকার ঘোষণার পাশাপাশি এখানে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান। জাতিসংঘ প্রবর্তিত মানব উন্নয়ন সূচকের হিসাব মতে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও সামাজিক বৈষম্য লক্ষণীয় মাত্রায় এখনো রয়ে গেছে। এসব সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে যেমন সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত অনিয়ম ও বিশৃংখলা, নারী-পুরুষ বৈষম্য ইত্যাদি।

জেন্ডার ও সামাজিকীকরণ

নারী-পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের বিষয়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যশা নিহিত রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতিতে। এই প্রত্যশার ফলেই সমাজে জেন্ডার ভূমিকা পালনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ছেলেমেয়েদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বড়দের জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়। এর ফলে আমরা ছেলেকে ছেলের মত এবং এর সাথে মেয়েকে মেয়ের মত আচরণ শিখতে অনুপ্রাণিত করি। এ শিক্ষা তাদের সামগ্রিক জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করে। সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ীই ছেলে মেয়ে তাদের শিশুকাল থেকে নিজেদেরকে তৈরি করে নেয় যা অবশিষ্ট জীবনে কাজে লাগে।

সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাবসমূহ

জেন্ডার বৈষ্যমের নানামুখী প্রভাব সমাজে বিদ্যমান। এটি এমন এক পরিস্থিতি হিসেবে সমাজে বিরাজ করে যে এটি সমাজের সদস্যদের কাছে 'খুব স্বাভাবিক ব্যাপার' বলে বিবেচিত হয়।

জন্ম সংক্রান্ত জেন্ডার বৈষম্য ও তার প্রভাব: আমাদের সমাজে ছেলে শিশুর গুরুত্ব বেশি। এ কারণে গর্ভস্থ বাচ্চা ছেলে হবে কি মেয়ে হবে সেটি আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত দম্পতি জেনে নেয় এবং যদি মেয়ে হয় তাহলে তারা সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখবে কিনা সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও বাংলাদেশে এমন প্রবণতা কমেছে কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজের এই প্রবণতা একেবারে দূর হয় নি। লিঙ্গভিত্তিক গর্ভপাত যদিও আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ-তার পরও গোপনে এমন ঘটনাগুলো মাঝে মধ্যেই ঘটে থাকে। ফলে মেয়ে শিশু গর্ভাবস্থাতেই জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হতে পারে।

মৌলিক সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত সমতা: সমাজের সুযোগ সুবিধাগুলো নারী পুরুষ সমানভাবে পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরাই বঞ্চনার শিকার হয়। যদি মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে শুধু শিক্ষার কথাই ধরি তো আমরা দেখব যে স্কুলগুলোতে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি। এর মূলেও রয়েছে জেন্ডার ভিত্তিক পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। উদাহরণস্বরূপ আফগানিস্তানে মেয়েদের শিক্ষা কার্যক্রম অবৈধ। অর্থাৎ মেয়েরা লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ করতে তথা স্কুলে যেতে পারবে না। মৌলিক চাহিদার আরেকটি বিষয় হিসেবে আমরা যদি খাদ্য ভাগের আলোচনা করি তো আমরা দেখতে পাব অনেক পরিবার রয়েছে যেখানে খাবারের ব্যাপারে ছেলেশিশু যত গুরুত্ব পায় মেয়ে শিশু ততটা পায় না। পরিবারের

পুরুষ সদস্যদের খাওয়া শেষ হলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই মা-মেয়ে ও পরিবারে বাকি নারী সদস্যরা ভাগ করে খায়। ফলে তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় না। আমাদের সমাজে এ ব্যাপারটি এতটাই স্বাভাবিক যে, প্রায়ই বিষয়টা কারো নজরে আসে না। এর মূল কারণ নিহিত রয়েছে জেন্ডার ভিত্তিক পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা।

বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেঃ মৌলিক চাহিদা বিষয়গুলোর পরই আসে বিশেষ সুযোগ সুবিধার প্রশ্ন। এখানে নারীরা বৈষম্যের শিকার। উদাহরণস্বরূপ নারীকে উচ্চশিক্ষায় পরিবার থেকে খুব বেশি উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখা যায়। শিক্ষার হার ও উচ্চ শিক্ষায় নারীর উপস্থিতি দেখলেই এ তথ্য খুব সহজে চোখে পড়ে। উচ্চশিক্ষা, নানা পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে পরিবারের অনীহা-এটি আমাদের সমাজের প্রায় সর্বত্র চোখে পড়ে।

পেশাগত ক্ষেত্রেঃ শিক্ষিত নারী পুরুষ যখন শিক্ষা লাভের পর পেশা জীবনে প্রবেশ করে তখন নারী যেন বৈষম্যের আরেক স্তরে প্রবেশ করে। আগেই বলা হয়েছে জেন্ডার বৈষম্যের এসব চিত্রগুলো সমাজের সর্বত্র এক রকম নয়। তবে একথা বলা যায় যেখানে শিক্ষার হার কম সেখানে বৈষম্যের সম্ভাবনা বেশি। পেশাগত ক্ষেত্রে নারী সে সকল বাধার শিকার হয় তা হলো পুরুষের তুলনায় নারীর মজুরী কম, পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারীর কম গুরুত্ব পাওয়া, চাকরি বা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উদাসীনতা, পরিবারের সদস্যদের অনীহা প্রভৃতি।

মালিকানার ক্ষেত্রেঃ অনেক সমাজ রয়েছে যেখানে সম্পদের মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাতেও এ পরিস্থিতি বিদ্যমান। পিতার সম্পদের সমান মালিকানা পুত্র-কন্যা পায় না। ছেলে বেশির ভাগ অংশ পায় এবং মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হয়।

সামাজিক ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যের যেসব প্রভাব আলোচনা করা হলো তা বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় খুব প্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপার। বৈষম্য কমানোর ওপরে একটা অঞ্চলের উন্নয়ন ও প্রগতি নির্ভর করে। শিক্ষার হার ও প্রভাব কম থাকলে সেখানে নানা সামাজিক সমস্যা, পশ্চাৎপদতা, গোঁড়ামী, কুসংস্কার দানা বেঁধে ওঠে। আবার কিছু ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শিক্ষার হার বেশি এমন অঞ্চলেও এসব সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকতে পারে। জেন্ডার বৈষম্য ঠিক এমনই এক সামাজিক বাস্তবতা। শিক্ষাই পারে এ সামাজিক সমস্যা থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। সময়ঃ ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

নারী-পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের বিষয়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা নিহিত রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতিতে। সমাজে এই প্রত্যাশার ফলেই সমাজে জেন্ডার ভূমিকা পালনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বৈষম্য কমানো অনেকটা সুষম অঞ্চলের উন্নয়ন ও প্রগতির উপর নির্ভর করে। শিক্ষার হার ও প্রভাব কম থাকলে সেখানে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা, পশ্চাৎপদতা, গোঁড়ামী, কুসংস্কার দানা বেঁধে ওঠে। আবার কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার হার অপেক্ষাকৃত বেশি এমন অঞ্চলেও এসব সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি জেন্ডার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে?
(i) শিক্ষা ক্ষেত্রে
(ii) মৌলিক সুবিধার ক্ষেত্রে
(iii) বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক
(ক) i+ iii (খ) i+ ii (গ) ii + iii (ঘ) i+ ii + iii

পাঠ-৮.৭ বৈষম্যবাদ : ধারণা, ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গি
Discrimination: Concept, Types and Perception

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বৈষম্যবাদ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- বৈষম্যবাদের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বৈষম্যবাদের বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	বৈষম্যবাদ, শ্রেণি, পদমর্যাদা, অঞ্চল, স্যাটেলাইট, প্রভাব ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

বৈষম্যবাদ হচ্ছে অসমতাভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা এবং অসমতার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তুলনায় থেকে হেয় প্রতিপন্ন করে তার প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। অন্য গোষ্ঠীর সদস্যকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে সাধারণত একটি শক্তিশালী দল বা গোষ্ঠী অনায়াসে পেয়ে থাকে। এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা বা অন্যান্য বিষয়গুলো কোনো যৌক্তিক বা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে।

বৈষম্যবাদ কী

বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সাধারণত সমাজের প্রচলিত ঐতিহ্য, নীতিমালা, মতবাদ, অনুশীলনসমূহ প্রতিষ্ঠান এবং আইনের ভিত্তিতে ধারণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি নীতিমালাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হয় যেটি চাকরিজীবী বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অনুসন্ধান করতে আগ্রহী করে। যেমন: আফ্রিকান-আমেরিকান বা মহিলারা দীর্ঘসময় ধরে আমেরিকায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

'বৈষম্য' শব্দটি ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষায় "Discrimination" হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Discriminat" শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে দুটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়কাল থেকে ইংরেজি "Discrimination" শব্দটি সাধারণত ইংরেজি শব্দ ভান্ডারে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করছে ব্যক্তির বর্ণভেদে তার চিকিৎসা পদ্ধতি বোঝার ধারক হিসেবে। বৈষম্যবাদ শব্দটি এসেছে "Discrimire " মানে হচ্ছে পার্থক্য করা, স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত করা এবং পৃথকীকরণ করা। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী বৈষম্যকে অসুবিধাপূর্ণ বিবেচনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বৈষম্যবাদ হচ্ছে একটি তুলনামূলক সংজ্ঞায়ন। একজন বৈষম্যকারী ব্যক্তি কখনোই বৈষম্যের শিকার ব্যক্তির কাছে কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখিন হয় না। বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি শুধু কিছু কারণে তারা সমাজে অন্যদের তুলনায় খারাপ বা নিচু প্রতিপন্ন হয়।

বৈষম্যের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য সমাজে দেখা যায়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১) **বয়স:** বয়স ভিত্তিক বৈষম্য সমাজে একটি বড় ধরনের সমস্যা। সাধারণত: কম বয়সীরা সংখ্যানুসারে বয়স্কদের তুলনায় বেশি থাকলেও তারা যথাযথ পদমর্যাদা পায় না। এছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কম বয়সীদের সিদ্ধান্ত যদি যথাপোযুক্তও হয় তাও তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথ চোখে দেখা হয় না।

২) **শ্রেণি:** শ্রেণি বৈষম্যে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইউনিসেফ ও মানবাধিকার সংস্থার অনুসারে সারা বিশ্বে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ইউনিসেফ এর তথ্যানুযায়ী শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য সাধারণত এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশ। যেমন- ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্তান, নেপাল, জাপান, আফ্রিকা মহাদেশ ও অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়। সাধারণত পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়, কর্তৃত্ব, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণি নির্ধারিত হয়।

৩) **প্রতিবন্ধী:** প্রতিবন্ধীরা সমাজে বিভিন্নভাবে বঞ্চনা বা বৈষম্যের শিকার হয়। প্রতিবন্ধীরা এমন এক ধরনের বৈষম্যের শিকার যারা সমাজের বিভিন্ন সরকারি বা প্রাইভেট কর্মক্ষেত্রে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধার সম্মুখিন হয়। সমাজে শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বলে বিবেচিত হয়।

৪) **চাকরি:** চাকরি ক্ষেত্রে একজন পুরুষের তুলনায় একজন নারী, একজন সাদা ব্যক্তির তুলনায় একজন কালো ব্যক্তি, একজন বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় একজন কম বয়স্ক ব্যক্তি বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। কর্মক্ষেত্রে বয়স, প্রতিবন্ধকতা, সম্প্রদায়, লিঙ্গ পরিচিতি, উচ্চতা, জাতীয়তা, ধর্ম, গায়ের রং, ওজন ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য হয়ে থাকে।

৫) **বর্ণবাদ বা সম্প্রদায়:** বর্তমান বিশ্বে বর্ণবাদের ভিত্তিতে বৈষম্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় বৈষম্য । সাধারণত: শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রো জনগোষ্ঠীকে একটা ঘৃণার চোখে দেখে। তাদের সব ধরনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বর্ণ বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

৬) **অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য:** আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। একজন মানুষ বা ব্যক্তি যে যেখানে জন্মগ্রহণ করে তার ভিত্তিতে সমাজে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সাধারণত এই ধরনের বৈষম্য সাংস্কৃতিক বৈষম্য, পারিভাষিক বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য ইত্যাদি ভিত্তিতে তৈরি হয়।

৭) **ধর্মীয় বিশ্বাস:** ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেও বৈষম্যের শিকার হয়। সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় বিশ্বাসের দেশে তুলনামূলক সংখ্যালঘু ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকারীরা প্রতিনিয়ত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

বৈষম্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে বৈষম্যবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন:

কার্ল মার্কস এবং বৈষম্যবাদ: কার্ল মার্কস এর মতে, বৈষম্যবাদ নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণ এবং মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের উপর। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণি উৎপাদনের উপকরণগুলোর নিয়ন্ত্রক ফলে শ্রমিক শ্রেণি শুধু তাদের শ্রম বিনিয়োগ করে যা আবার শোষণমূলক। বুর্জোয়ারা পদমর্যাদা ও শক্তির অধিকারী হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণি লভ্যাংশ পায় না ফলে শোষণের মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায়ও জমির মালিক ও সাধারণ কৃষকের মধ্যে বৈষম্যের উপস্থিতি ছিল।

ম্যাক্স ওয়েবার এবং বৈষম্যবাদ: ক্লাসিকাল সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার কার্ল মার্কস এর মতবাদ দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মার্কসের মতবাদকে প্রত্যাখান করেন। তিনি মনে. করেন পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের পাশাপাশি অন্যান্য উপাাদানসমূহ ও বৈষম্যের নিয়ামক, যেগুলো নিম্নরূপ-

(১) শ্রেণি (২) সম্মান এবং (৩) ক্ষমতা

উপরোক্ত তিনটি দ্বান্দ্বিক উপাদান মানুষের বৈষম্যকে প্রভাবিত করে। ওয়েবার মনে করেন সমাজে মানুষ ওপরের এই তিন ধরনের উপাদান পরিপূর্ণ করার জন্য সকল প্রকার বৈষম্যে লিপ্ত হয়। যদি এই তিন ক্ষেত্রে সমতা আনা যায় তাহলেই সমাজ থেকে বৈষম্য দূরীকরণ করা সম্ভব।

ডুর্খেইম এবং বৈষম্যবাদ: ডুর্খেইম ম্যাক্স ওয়েবারের সমসাময়িক তবে ওয়েবার যেখানে যৌক্তিকতার উপর বেশি জোর দিয়েছেন সেখানে ডুর্খেইম শ্রমের বিভাজনের উপর জোর দিয়েছেন এবং একই সাথে তিনি সমাজে সংহতিবোধ এর উপর জোর দিয়েছেন। ডুর্খেইম মনে করেন সামাজিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বৈষম্যবাদের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বৈষম্যবাদ শব্দটি এসেছে "Discrimire" মানে হচ্ছে পার্থক্য করা, স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত করা এবং পৃথকীকরণ করা। সামাজিক দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা ও সামাজিক পরিচিতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে Rubin I Hewstone তিন ধরনের বৈষম্যকে আলোকপাত করেছেন। যথা-বাস্তবিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক প্রতিযোগিতা এবং Consensual বৈষম্য। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সাধারণত: সমাজের প্রচলিত ঐতিহ্য, নীতিমালা, মতবাদ, অনুশীলনসমূহ প্রতিষ্ঠনি এবং আইনের ভিত্তিতে ধারণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি নীতিমালাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হয় যেটি চাকরিজীবী বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অনুসন্ধান করতে আগ্রহী করে। যেমন: আফ্রিকান-আমেরিকান বা মহিলারা দীর্ঘসময় ধরে আমেরিকায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা কে করা ভাগে করা যায় ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৬টি

২। 'সংহতি বোধ' ধারনাটি কার ?

(ক) কার্ল মার্ক্স (খ) ম্যাকস ওয়েবার

(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) রবিনসন

পাঠ-৮.৮ সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা এবং মাধ্যম
Concept and Means of Social Safety

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা আলোচনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	সামাজিক নিরাপত্তা, পরিকল্পনা, দারিদ্র্য সীমা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

একটা দেশে বসবাসরত মানুষের আর্থিক অবস্থা একই রকম হয় না। একটা অংশ আর্থিকভাবে খুব সচ্ছল হতে পারে আবার কোনো অংশ হয়ত আর্থিক বিবেচনায় খুব অসচ্ছল। অসচ্ছল জনগোষ্ঠী তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে না। এ কারণে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য সবদেশের সরকারই কিছু না কিছু পরিকল্পনা থাকে। এ ধরনের একটা পরিকল্পনার নাম হলো সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা।

সামাজিক নিরাপত্তা

সম্প্রতি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মানদন্ডে এবং জীনযাপনের মানদন্ডের সাধারণ মানুষের বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে দেশের মোট জনবসতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। এসব দরিদ্র এবং হতদরিদ্র মানুষদের সহায়তাদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নানামুখী পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা (Social Safety Net) চালু রয়েছে সেগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় (১) নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি; (২) দুর্যোগ এবং অন্যান্য বিপত্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মত পরিকল্পনা; (৩) সন্তানের শিক্ষা প্রদানে সহায়তা করার জন্য পিতামাতাদেরকে প্রদেয় সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থা; (৪) পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যে সরকারি ভর্তুকি কার্যক্রম। সাহায্য প্রদানের ধরন অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে– (ক) সরাসরি নগদ টাকা প্রদান করা এবং (খ) খাদ্য প্রদান করা।

সরকারি এই প্রচেষ্টার ফলে দেখা গেছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। শিক্ষায় জেন্ডার পার্থক্য কমেছে, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে, বিভিন্ন দুর্যোগে খাদ্য সহায়তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে, মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা বেড়েছে, সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা–যাতে তারাও এক সক্ষম জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতে পারে।

১৬ কোটির অধিক মানুষের এই ছোট দেশে সব মানুষের সুযোগ সৃষ্টি করা সহজ কাজ নয়। এ জন্য দরকার এক শক্তিশালী অর্থনীতির, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশে এখনো পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আবার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে বলে তারা অর্থনীতিতে শক্ত কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এই দুর্বলতম অংশকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনাগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

সীমিত সম্পদ এবং সীমিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে বাড়তি জনসংখ্যার চাপকে প্রায়শই সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, নদীভাঙন ইত্যাদি নানা কারণে গ্রাম থেকে বহুমানুষ জীবিকার আশায় শহরমুখী হয়। একারণে শহরে বস্তি গড়ে উঠছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগই শহরবাসী অথচ বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাও সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। গ্রামের মানুষকে গ্রামে ধরে রাখার জন্য এবং উৎপাদন বাড়াবার জন্য সরকার কৃষিতেও ভর্তুকি দিচ্ছে। দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের ভিত্তিতে ১৯৮৮-৮৯ সময়ে দারিদ্রের হার ছিল শতকরা ৪৭ ভাগ। সরকারের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার ফলে গ্রামীণ ও শহুরে দারিদ্র্য উভয়েই কমানো সম্ভব হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে দারিদ্র দূরীকরণে উন্নয়ন পরিকল্পনার শীর্ষে ঠাঁই দিয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের মাত্রা শতকরা ১৫ ভাগে নামিয়ে আনা। এক্ষেত্রে ধারণা করা হচ্ছে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ, যেসব মৌসুমে কাজ থাকে না সেসব মৌসুমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সেই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্রের হার লক্ষণীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে তাদেরকে যারা চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে, দরিদ্র নারীদেরকে, ভূমিহীন এবং অন্যান্য বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে। একটি শক্তিশালী এবং বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনাই পারে দারিদ্র্যকে পুরোপুরি নির্মূল করতে। সরকারের লক্ষ্য সেটাই।

সরকারের অর্থবাজেট ও পরিসংখ্যানে তাই সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Net) র আওতায় চার ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে: (১) সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা, যাতে করে গরীব ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী দারিদ্রকে ভালভাবে সামাল দিতে পারে; (২) ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য তহবিল গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্র ও চাকুরির নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা; (৩) খাদ্য নিরাপত্তাভিত্তিক কার্যক্রম-যাতে করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সমস্যাদি অঞ্চলভেদে তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারে এবং (৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ট্রেনিং এর পরিধি বাড়ানো যাতে নতুন প্রজন্মকে আরো বেশি করে সক্ষম এবং স্বনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।এর আওতায় এ টাকা ব্যয় হবে কয়েকটি ক্ষেত্রে, এর মধ্যে রয়েছে Food For Works (FFW) বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, Vulnerable Group Feeding (VGF), Gratuitious Relief (G R Food), এবং চট্রগ্রামে পাহাড়ী অঞ্চলে খাদ্য সহায়তা প্রদান। বয়স্কভাতার পরিধিও বাড়ানো হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উদ্যোগ, পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক নির্বাচিত সরকারই করে থাকে। এর লক্ষ্য থাকে সামাজিক ঝুঁকি মোকাবিলা, দারিদ্র দূরীকরণ এবং দুর্বলতম জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতার পথ দেখিয়ে তাদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

দরিদ এবং অসচ্ছল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনার নাম হলো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। দরিদ্র এবং হতদরিদ্র মানুষদের সহায়তাদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নানামুখী পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারি এ পরিকল্পনার ফলে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা– যাতে তারাও এক সক্ষম জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা কে করা ভাগে করা যায় ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৬টি

২। নিচের কোনটি Social Safety Net নয়

(i) Food For works

(ii) Vulnerable group Food

(iii) Gratuitous Relief

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii + iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। কোন ক্ষেত্রে অসমতা নেই ?

(ক) রাজনীতি (খ) আয় ও সম্পদ

(গ) জাতি (ঘ) কোনোটিই নয়

২। হাম্বুরাবির আইন অনুসারে দাসপ্রথা-

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ

(গ) শুধু নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য (ঘ) শুধু নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রযোজ্য

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। 'Dominant Ideology'-র ধারক-বাহক কোনটি?

(i) ধর্ম

(ii) শিক্ষা

(iii) গণমাধ্যম

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ময়মনসিংহ জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে রতনের বাড়ি। সে পেশায় কৃষক। তার অনেক জমি ছিল। গ্রামের মোড়লের ধার শোধ দিতে না পারায় মোড়ল রতনের সকল জমি দখল করে নেয়। এখন সে মোড়লের অধীনে কাজ করে। মোড়ল যখন যা বলে রতন তা শুনতে বাধ্য থাকে।

১) সামাজিক স্তরবিন্যাস কী?

২) সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন কয়টি ও কী কী?

৩) উদ্দীপকটি সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ধরনকে সমর্থন করে?

৪) উদ্দীপকের রতন ও মোড়লের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সামন্ত প্রথার কোন দুই চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে? মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ ঃ ১। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ ঃ ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ ঃ ১। গ ২। গ